মুহাম্মাদ

৪৭

নামকরণ

সূরার ২ নম্বর আয়াতের অংশ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান নামটি উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া এ সূরার আরো একটি বিখ্যাত নাম "কিতাল"। এ নামটি ২০নং আয়াতের وَذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ বাক্যটি থেকে গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরার বিষয়বস্তু সাক্ষ দেয় যে, সূরাটি হিজরতের পরে এমন এক সময় মদীনায় নাযিল হয়েছিল যখন যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল বটে কিন্তু কার্যত যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত দলীল–প্রমাণ পরে ৮নং টীকায় পাওয়া যাবে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যে সময় এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল সে সময়ের পরিস্থিতি ছিল এই যে, বিশেষ করে পবিত্র মক্কা নগরীতে এবং সাধারণভাবে গোটা আরব ভূমির সর্বত্র মুসলমানদেরকে জুলুম নির্যাতনের লক্ষস্থল বানানো হচ্ছিলো এবং তাদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ করে দেয়া হয়েছিলো। মুসলমানগণ সমস্ত অঞ্চল থেকে এসে মদীনার নিরাপদ আশ্রয়ে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের কাফেররা এখানেও তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিতে প্রস্তুত ছিল না। মদীনার ক্ষুদ্র জনপদটি চারদিক থেকেই কাফেরদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিল। তারা এটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য মাত্র দু'টি পথই খোলা ছিল। হয় তারা দীনে হকের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজই শুধু নয় বরং তার আনুগত্য ও অনুসরণও পরিত্যাগ করে জাহেলিয়াতের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। নয়তো জীবন বাজি রেখে প্রাণপণে লড়াই করবে এবং চিরদিনের জন্য এ বিষয়ের ফায়সালা করে দেবে যে, আরবের মাটিতে ইসলাম থাকবে না জাহেলিয়াত থাকবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে দৃঢ় সংকল্পের পথ দেখিয়েছেন যেটি ঈমানদারদের একমাত্র পথ। তিনি সূরা হজ্জে (আয়াত ৩৯) প্রথমে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন এবং পরে সূরা বাকারায় (আয়াত ১৯০) যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্তু সে সময় সবাই জানতো যে, এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের অর্থ কি? মদীনায় ঈমানদারদের

একটা ক্ষুদ্র দল ছিল যার যুদ্ধ করার মত পুরা এক হাজার যোদ্ধা সংগ্রহ করার সামর্থও ছিল না। অথচ তাদেরকেই তরবারি নিয়ে সমগ্র আরবের জাহেলিয়াতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। তাছাড়া যে জনপদে আশ্রয়হীন ও সহায় সম্বলহীন শত শত মুহাজির এখনো পুরোপুরি পুনর্বাসিত হতে পারেনি, আরবের অধিবাসীরা চারদিক থেকে আর্থিক বয়কটের মাধ্যমে যার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং অভুক্ত থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করাও যার পক্ষে কঠিন ছিল এখন তাকেই লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এহেন পরিস্থিতিতে সূরাটি নাযিল করা হয়েছিল। ঈমানদারদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা। এবং এ বিষয়ে প্রাথমিক পথনির্দেশনা দেয়াই এর আলোচ্য ও বক্তব্য। এ দিকটি বিচার করে এর নাম "সূরা কিতাল"ও রাখা হয়েছে। এতে ধারাবাহিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরার প্রথমেই বলা হয়েছে যে, এখন দু'টি দলের মধ্যে মোকাবিলা হচ্ছে। এ দু'টি দলের মধ্যে একটি দলের অবস্থান এই যে, তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অপর দলটির অবস্থান হলো, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে সত্য নাযিল হয়েছিল তা তারা মেনে নিয়েছে। এখন আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হলো, প্রথমোক্ত দলটির সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ও কাজ-কর্ম তিনি নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং শেষোক্ত দলটির অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।

এরপর মুসলমানদের সামরিক বিষয়ে প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর সাহায্য ও দিকনির্দেশনার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পথে কুরবানী পেশ করার জন্য তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। তাদের এ বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, ন্যায় ও সত্যের পথে তাদের প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না। বরং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই তারা ক্রমান্বয়ে এর অধিক ভাল ফল লাভ করবে।

তারপর কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাহায্য ও দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রচেষ্টাই কার্যকর হবে না। তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত খারাপ পরিণামের সম্মুখীন হবে। তারা আল্লাহর নবীকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে মনে করেছিলো যে, তারা বড় রকমের সফলতা লাভ করেছে। অথচ এ কাজ করে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেরা নিজেদের জন্য বড় রকমের ধ্বংস ডেকে এনেছে।

এরপর মুনাফিকদের উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বে এসব মুনাফিক নিজেদেরকে বড় মুসলমান বলে জাহির করতো। কিন্তু এ নির্দেশ আসার পরে তারা ঘাবড়ে গিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ চিন্তায় কাফেরদের সাথে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছিল যাতে তারা নিজেদেরকে যুদ্ধের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। তাদেরকে স্পষ্টভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর দীনের সাথে মুনাফিকীর

আচরণ করে তাদের কোন আমলই আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না। এখানে যে মৌলিক প্রশ্নে ঈমানের দাবীদার প্রতিটি ব্যক্তির পরীক্ষা হচ্ছে তা হলো, সে ন্যায় ও সত্যের সাথে আছে না বাতিলের সাথে আছে? তার সমবেদনা ও সহানুভূতি মুসলমান ও ইসলামের প্রতি না কাফের ও কুফরীর প্রতি। সে নিজের ব্যক্তি সত্তা ও স্বার্থকেই বেশী ভালবাসে না কি যে ন্যায় ও সত্যের প্রতি ঈমান আনার দাবী সে করে তাকেই বেশী ভালবাসে? এ পরীক্ষায় যে ব্যক্তি মেকী প্রমাণিত হবে আল্লাহর কাছে তার নামায, রোযা এবং যাকাত কোন প্রতিদান লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া তো দূরের কথা সে আদৌ ঈমানদারই নয়।

অতপর মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের সংখ্যাল্পতা ও সহায় সম্বলহীনতা এবং কাফেরদের সংখ্যাধিক্য ও সহায় সম্বলের প্রাচুর্য দেখে সাহস না হারায় এবং তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ না করে। এতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের দুঃসাহস আরো বেড়ে যাবে। বরং তারা যেন আল্লাহর ওপর নির্ভর করে বাতিলকে রুখে দাঁড়ায় এবং কুফরের এ আগ্রাসী শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আল্লাহ মুসলমানদের সাথে আছেন। তারাই বিজয়ী হবে এবং তাদের সাথে সংঘাতে কুফরী শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

সর্বশেষে মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার আহবান জানানো হয়েছে। যদিও সে সময় মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিল। কিন্তু সামনে প্রশ্ন ছিল এই যে, আরবে ইসলাম এবং মুসলমানরা টিকে থাকবে কি থাকবে না। এ প্রশ্নের গুরুত্ব ও নাজুকতার দাবী ছিল এই যে, মুসলমানরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের দীনকে কুফরের আধিপত্যের হাত থেকে রক্ষা করার এবং আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য তাদের জীবন কুরবানী করবে ও যুদ্ধ প্রস্তুতিতে নিজেদের সমস্ত সহায় সম্পদ যথা সম্ভব অকৃপণভাবে কাজে লাগাবে। সুতরাং মুসলমানদের উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, এ মুহূর্তে যে ব্যক্তি কৃপণতা দেখাবে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না, বরং নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে। আল্লাহ মানুষের মুখাপেক্ষী নন। কোন একটি দল বা গোষ্ঠী যদি তার দীনের জন্য কুরবানী পেশ করতে টালবাহানা করে তাহলে আল্লাহ তাদের অপসারণ করে অপর কোন দল বা গোষ্ঠীকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ① وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ② ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ③

যারা কুফরী করেছে[১] এবং আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিয়েছে[২] আল্লাহ তাদের সমস্ত কাজ–কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন[৩]। আর যারা ঈমান এনেছে নেক কাজ করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে[৪] তা মেনে নিয়েছে—বস্তুত তা তো তাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অকাট্য সত্য কথা—আল্লাহ তাদের খারাপ কাজগুলো তাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন[৫] এবং তাদের অবস্থা শুধরে দিয়েছেন।[৬] কারণ হলো, যারা কুফরী করেছে তারা বাতিলের আনুগত্য করেছে এবং ঈমান গ্রহণকারীগণ তাদের রবের পক্ষ থেকে আসা সত্যের অনুসরণ করেছে। আল্লাহ এভাবে মানুষের সঠিক মর্যাদা ও অবস্থান বলে দেন।[৭]

১. অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিক্ষা ও পথনির্দেশনা পেশ করছেন তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

২. মূল আয়াতে صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বলা হয়েছে। صَدّ শব্দটি আরবী ভাষায় সকর্মক ও অকর্মক উভয় ক্রিয়াপদ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। তাই এ আয়াতাংশের একটি অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেরা আল্লাহর পথে আসা থেকে বিরত থেকেছে এবং আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তারা অন্যদের আল্লাহর পথে আসতে বাধা দিয়েছে।

অন্যদের আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়ার বহু উপায় ও পন্থা আছে। এর একটি পন্থা হলো, জোরপূর্বক কাউকে ঈমান গ্রহণ থেকে বিরত রাখা। দ্বিতীয় পন্থা হলো ঈমান

গ্রহণকারী ব্যক্তির ওপর এমন জুলুম–নির্যাতন চালানো যে, তার পক্ষে ঈমানের ওপর টিকে থাকা এবং এরূপ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে অন্যদের ঈমান গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে। তৃতীয় পন্থা হলো, সে নানা উপায়ে দীন ও দীনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে এবং হৃদয় মনে এমন সন্দেহ–সংশয় সৃষ্টি করবে যার দ্বারা মানুষ এ দীন সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করবে। এ ছাড়াও প্রত্যেক কাফের ব্যক্তিই এ অর্থে আল্লাহর দীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যে, সে তার সন্তান–সন্ততিকে কুফরী রীতিনীতি অনুসারে লালন–পালন করে এবং এ কারণে তার ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য বাপ–দাদার ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করা কঠিন হয়ে যায়। একইভাবে প্রতিটি কুফরী সমাজ আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টিকারী একটি জগদ্দল পাথরের মত। কারণ, এ সমাজ তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দ্বারা তার সমাজ ব্যবস্থা ও রীতিনীতি এবং সংকীর্ণতা দ্বারা ন্যায় ও সত্য দীনের প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

৩. মূল আয়াতে أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কাজ–কর্মকে বিপথগামী করে দিয়েছেন, পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন, ধ্বংস বা পণ্ড করে দিয়েছেন। একথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে তাদের চেষ্টা ও শ্রম সঠিক পথে ব্যয়িত হওয়ার তাওফীক ছিনিয়ে নিয়েছেন। এখন থেকে যে কাজই তারা করবে তা ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে ভ্রান্ত পন্থায়ই করবে। আর তাদের সকল চেষ্টা–সাধনা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীর পথেই ব্যয়িত হবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেদের ধারণায় যে কাজ ভাল মনে করে আঞ্জাম দিয়ে আসছে, যেমন ঃ কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধান, হাজীদের খেদমত, মেহমানদের আপ্যায়ণ, আত্মীয়–স্বজনদের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা এবং অনুরূপ আরো যেসব কাজকে আরবে ধর্মীয় সেবা এবং উন্নত নৈতিক কাজের মধ্যে গণ্য করা হতো, তা সব আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন। তারা তার কোন প্রতিদান ও সওয়াব পাবে না। কারণ যখন তারা আল্লাহর তাওহীদ এবং শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাতের পথ অবলম্বন করতে অস্বীকৃতি জানায় আর অন্যদেরকেও এ পথে আসতে বাধা দেয় তখন তাদের কোন কাজই আল্লাহর কাছে গৃহীত হতে পারে না। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, ন্যায় ও সত্যের পথকে বন্ধ করতে এবং নিজেদের কুফর ভিত্তিক ধর্মকে আরবের বুকে জীবিত রাখার জন্য তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা–সাধনা চালাচ্ছে আল্লাহ তা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এখন তাদের সমস্ত কৌশল একটি লক্ষহীন তীরের মত প্রমাণিত হয়েছে। এসব কৌশল দ্বারা তারা কখনো নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে না।

৪. الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলার পর اٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ বলার প্রয়োজন আর থাকে না। কেননা, ঈমান আনয়ন করার মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিলকৃত শিক্ষাসমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করা আপনা থেকেই অন্তরভুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলাদাভাবে বিশেষ করে এর উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, নবী হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানোর পর কোন ব্যক্তি যতক্ষণ না তাঁকে এবং তাঁর আনিত শিক্ষাসমূহকে মেনে না নেবে ততক্ষণ আল্লাহ, আখেরাত, পূর্ববর্তী নবী–রসূল ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ সে যতই মেনে চলুক না কেন তা তার জন্য কল্যাণকর হবে না। একথাটা স্পষ্টভাবে বলা জরুরী ছিল। কারণ, হিজরতের পরে মদীনায়

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۖ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قَٰتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾

অতএব এসব কাফেরের সাথে যখনই তোমাদের মোকাবিলা হবে তখন প্রথম কাজ হবে তাদেরকে হত্যা করা। এভাবে তোমরা যখন তাদেরকে আচ্ছামত পর্যুদস্ত করে ফেলবে তখন বেশ শক্ত করে বাঁধো। এরপর (তোমাদের ইখতিয়ার আছে) হয় অনুকম্পা দেখাও, নতুবা মুক্তিপণ গ্রহণ করো যতক্ষণ না যুদ্ধবাজরা অস্ত্র সংবরণ করে।[৮]

এটা হচ্ছে তোমাদের করণীয় কাজ। আল্লাহ চাইলে নিজেই তাদের সাথে বুঝাপড়া করতেন। কিন্তু (তিনি এ পন্থা গ্রহণ করেছেন এ জন্য) যাতে তোমাদেরকে পরস্পরের দ্বারা পরীক্ষা করেন।[৯] *আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ কখনো তাদের আমলসমূহ ধ্বংস করবেন না।*[১০] *তিনি তাদের পথপ্রদর্শন করবেন। তাদের অবস্থা শুধরে দিবেন এবং তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পরিচয় তিনি তাদেরকে আগেই অবহিত করেছেন।*[১১]

এমন সব লোকের সাথে আদান-প্রদান ও উঠাবসা করতে হচ্ছিলো যারা ঈমানের আর সব আবশ্যকীয় বিষয় মানলেও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিলো।

৫. এর দু'টি অর্থ ঃ একটি হচ্ছে, তাদের দ্বারা জাহেলী যুগে যে গোনাহর কাজ সংঘটিত হয়েছিল আল্লাহ তার সবই তাদের হিসেব থেকে বাদ দিয়েছেন। ঐ সব গোনাহর কাজের জন্য এখন আর তাদের কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, আকীদা, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, নৈতিক চরিত্র এবং কাজ-কর্মের যে পঙ্কিলতার মধ্যে তারা ডুবে ছিল আল্লাহ তা'আলা তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করেছেন। এখন তাদের মন-মস্তিষ্ক পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। তাদের অভ্যাস ও আচার-আচরণ পরিবর্তিত হয়েছে এবং তাদের জীবন, চরিত্র ও কর্মকাণ্ডও পরিবর্তিত হয়েছে। এখন তাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের পরিবর্তে আছে ঈমান এবং দুষ্কৃতির পরিবর্তে আছে সুকৃতি।

৬. একথাটিরও দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, অতীতের অবস্থা পরিবর্তিত করে আল্লাহ তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সঠিক পথে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের জীবনকে সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত করে দিয়েছেন। আরেকটি অর্থ হচ্ছে এখন পর্যন্ত তারা যে দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতিত অবস্থার মধ্যে ছিল তা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বের করে এনেছেন। এখন তিনি তাদের জন্য এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, তারা জুলুমের শিকার হওয়ার পরিবর্তে জালেমের মোকাবিলা করবে, শাসিত হওয়ার পরিবর্তে নিজেরাই স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবন পরিচালনা করবে এবং বিজিত না হয়ে বিজয়ী হয়ে থাকবে।

৭. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ । অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা এভাবে মানুষের জন্য তাদের উদাহরণ পেশ করেন।" এটি এ আয়াতাংশের শাব্দিক অনুবাদ। কিন্তু শাব্দিক এ অনুবাদ দ্বারা এর প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট হয় না। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, এভাবে আল্লাহ তা'আলা উভয় দলকে তাদের অবস্থান সঠিকভাবে বলে দেন। তাদের একদল বাতিলের অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত চেষ্টা–সাধনাকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন। কিন্তু অপর দল ন্যায় ও সত্যের আনুগত্য গ্রহণ করেছে। তাই আল্লাহ তাদেরকে সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্ত করে তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।

৮. এ আয়াতের শব্দাবলী এবং যে পূর্বাপর প্রসংগে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তা থেকেও একথা স্পষ্ট জানা যায় যে, আয়াতটি যুদ্ধের নির্দেশ আসার পর কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছিল। "যখন কাফেরদের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হবে" কথাটিও ইংগিত দেয় যে, তখনও মোকাবিলা হয়নি বরং মোকাবিলা হলে কি করতে হবে সে সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

যে সময় সূরা হজ্জের ৩৯ আয়াতে এবং সূরা বাকারার ১৯০ আয়াতে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং যার কারণে ভয়ে ও আতংকে মদীনার মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল এই যে, মৃত্যু যেন তাদের মাথার ওপর এসে হাজির হয়েছে, ঠিক সে সময়ই যে, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তা এর ২০ আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয়।

তাছাড়া সূরা আনফালের ৬৭–৬৯ আয়াতগুলো থেকেও এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতটি বদর যুদ্ধের আগেই নাযিল হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

"শত্রুকে যুদ্ধে উচিত মত শিক্ষা দেয়ার আগেই <u>নবীর হাতে তারা বন্দী হবে এমন কাজ কোন নবীর জন্য শোভনীয় নয়। তোমরা পার্থিব স্বার্থ কামনা করো</u>। কিন্তু আল্লাহর বিচার্য বিষয় হচ্ছে আখেরাত। আল্লাহ বিজয়ী ও জ্ঞানী। আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি আগেই লিপিবদ্ধ না থাকতো তাহলে তোমরা যা নিয়েছো সে জন্যে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হতো। সুতরাং যে অর্থ তোমরা অর্জন করেছো তা খাও। কারণ, তা হালাল ও পবিত্র।"

এ বাক্যটি এবং বিশেষ করে এর নীচে দাগ টানা বাক্যাংশ সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ ক্ষেত্রে যে কারণে তিরস্কার করা হয়েছে তা হচ্ছে বদর যুদ্ধে শত্রুদেরকে চরম শিক্ষা দেয়ার আগেই মুসলমানরা শত্রুদের লোকজনকে বন্দী করতে শুরু করেছিল। অথচ যুদ্ধের পূর্বে সূরা মুহাম্মাদে তাদেরকে যে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে ঃ "তোমরা যখন তাদেরকে আচ্ছামত পদদলিত করে ফেলবে তখন

বন্দীদের শক্ত করে বাঁধবে।" তা সত্ত্বেও সূরা মুহাম্মাদে যেহেতু মুসলমানদেরকে বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ নেয়ার অনুমতি মোটের ওপর দেয়া হয়েছিল তাই বদর যুদ্ধের বন্দীদের নিকট থেকে যে অর্থ নেয়া হয়েছিল আল্লাহ তা'আলা তা হালাল ঘোষণা করলেন এবং তা গ্রহণ করার জন্য মুসলমানদের শাস্তি দিলেন না। "যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগেই লিপিবদ্ধ না থাকতো" কথাটি স্পষ্টত এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত দান করে যে, এ ঘটনার পূর্বেই কুরআন মজীদে মুক্তিপণ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। একথাটিও স্পষ্ট যে, কুরআনের সূরা মুহাম্মাদ ছাড়া এমন আর কোন আয়াত নেই যেখানে এ নির্দেশ আছে। তাই একথা মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায়ান্তর নেই যে, এ আয়াতটি সূরা আনফালের পূর্বোল্লেখিত আয়াতের আগে নাযিল হয়েছিল। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন। সূরা আনফালের ব্যাখ্যা, টীকা ৪৯)

এটি কুরআন মজীদের সর্বপ্রথম আয়াত যাতে যুদ্ধের আইন-কানুন সম্পর্কে প্রাথমিক দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ থেকে যেসব বিধি-বিধান উৎসারিত হয় এবং সে বিধি-বিধান অনুসারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা কিরাম যেভাবে আমল করেছেন এবং ফিকাহবিদগণ এ আয়াত ও সুন্নাতের আলোকে গবেষণার ভিত্তিতে যেসব হুকুম-আহকাম রচনা করেছেন তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ থাকে শত্রুর সামরিক শক্তি ধ্বংস করা যাতে তার যুদ্ধ করার ক্ষমতা না থাকে এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ লক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে শত্রুর লোকজনকে বন্দী করতে লেগে যাওয়া অনুচিত। শত্রু সেনাদেরকে যুদ্ধবন্দী করার প্রতি মনোযোগ দেয়া কেবল তখনই উচিত যখন শত্রুর শক্তির আচ্ছামত মূলোৎপাটন হবে এবং যুদ্ধের ময়দানে তাদের কেবল মুষ্টিমেয় কিছু লোকই অবশিষ্ট থাকবে। প্রারম্ভেই মুসলমানদেরকে এ দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছিল যাতে তারা মুক্তিপণ লাভ অথবা ক্রীতদাস সংগ্রহের লোভে পড়ে যুদ্ধের মূল লক্ষ ও উদ্দেশ্য ভুলে না বসে।

দুই ঃ যুদ্ধে যারা গ্রেফতার হবে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের ইখতিয়ার আছে। তোমরা ইচ্ছা করলে, দয়াপরবশ হয়ে তাদের মুক্তি দাও অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও। এ থেকে এ সাধারণ বিধানের উৎপত্তি হয় যে, যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা যাবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হাসান বাসরী, আতা এবং হাম্মাদ এ আইনাটিকে অবিকল এরূপ সর্বব্যাপী ও শর্তহীন আইন হিসেবেই গ্রহণ করেছেন এবং তা যথাস্থানে সঠিকও বটে। তারা বলেন ঃ যুদ্ধরত অবস্থায় মানুষকে হত্যা করা যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে এবং বন্দীরা আমাদের দখলে চলে আসলে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। ইবনে জারীর এবং আবু বকর জাস্সাস বর্ণনা করেছেন যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যুদ্ধ বন্দীদের একজনকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) হাতে দিয়ে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং এ আয়াত পড়ে বললেন ঃ আমাদেরকে বন্দী অবস্থায় কাউকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সিয়ারুল কাবীর গ্রন্থেও এ বিষয়ে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমের হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে (রা) একজন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এ যুক্তির ভিত্তিতেই সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করেছিলেন।

তিন ঃ কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু হত্যা করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়নি তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর এ নির্দেশের অভিপ্রায় বুঝেছেন এই যে, যদি এমন কোন বিশেষ কারণ থাকে যার ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক কোন বন্দী অথবা কিছু সংখ্যক বন্দীকে হত্যা করা জরুরী মনে করেন তবে তিনি তা করতে পারেন। এটা কোন স্বাভাবিক ব্যাপকভিত্তিক নিয়ম-বিধি নয়, বরং একটি ব্যতিক্রমী নিয়ম-বিধি যা কেবল অনিবার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্য থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু উকবা ইবনে আবী মু'আইত এবং নাদ্বর ইবনে হারেসকে হত্যা করেছিলেন। ওহুদ যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে শুধু কবি আবু আয্যাকে হত্যা করেছিলেন। বনী কুরাইযা গোত্র নিজেরাই নিজেদেরকে হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের সিদ্ধান্তের ওপর সোপর্দ করেছিল এবং তাদের নিজেদের সমর্থিত বিচারকের রায় ছিল এই যে, তাদের পুরুষদের হত্যা করতে হবে, তাই তিনি তাদের হত্যা করিয়েছিলেন। খায়বার যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে শুধু কিনানা ইবনে আবীল হুকাইককে হত্যা করা হয়েছিল। কারণ, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। মক্কা বিজয়ের পরে সমস্ত মক্কাবাসীর মধ্য থেকে শুধু কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের মধ্যে যে-ই বন্দী হবে তাকেই হত্যা করতে হবে। এ কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোন যুদ্ধবন্দী হত্যা করা কখনো নবীর (সা) কর্মনীতি ছিল না। আর খোলাফায়ে রাশেদীনেরও কর্মধারা এরূপ ছিল। তাঁদের শাসন যুগেও যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করার দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখা যায়। আর দু'একটি দৃষ্টান্ত থাকলেও নির্দিষ্ট কোন কারণে তাদের হত্যা করা হয়েছিল—কেবল যুদ্ধবন্দী হবার কারণে নয়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযও তাঁর গোটা খিলাফত যুগে শুধু একজন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করেছিলেন। এর কারণ ঐ ব্যক্তি মুসলমানদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। এ কারণেই অধিকাংশ ফিকাহবিদ এ মত সমর্থন করেছেন যে, ইসলামী সরকার প্রয়োজন মনে করলে বন্দীদের হত্যা করতে পারেন। তবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সরকারের। যাকে ইচ্ছা হত্যা করার অধিকার কোন সৈনিকেরই নেই। তবে বন্দী যদি পালিয়ে যাওয়ার কিংবা তার কোন প্রকার কুমতলবের আশংকা সৃষ্টি হয় তাহলে যিনি এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামী ফিকাহবিদগণ আরো তিনটি বিষয় পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছেন। এক, বন্দী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না। দুই, বন্দীকে ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যা করা যাবে যতক্ষণ সে সরকারের হাতে থাকবে। বন্টন বা বিক্রির মাধ্যমে সে যদি অন্য কারো মালিকানাভুক্ত হয়ে যায় তাহলে আর তাকে হত্যা করা যাবে না। তিন, বন্দীকে হত্যা করতে হলে সোজাসুজি হত্যা করতে হবে। কষ্ট দিয়ে হত্যা করা যাবে না।

চার ঃ যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে সাধারণভাবে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, হয় তাদের প্রতি দয়া কর নয় তো মুক্তিপণের আদান প্রদান করো।

ইহসানের মধ্যে চারটি জিনিস অন্তরভুক্ত। এক, বন্দী থাকা অবস্থায় তার সাথে ভাল আচরণ করতে হবে। দুই, হত্যা বা স্থায়ীভাবে বন্দী করার পরিবর্তে তাকে দাস বানিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। তিন, জিযিয়া আরোপ করে তাকে জিম্মী অর্থাৎ নিরাপত্তা প্রাপ্ত বানিয়ে নিতে হবে। চার, কোন বিনিময় ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দিতে হবে।

মুক্তিপণ গ্রহণের তিনটি পন্থা আছে। এক, অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া। দুই, মুক্তি দানের শর্ত হিসেবে বিশেষ কোন সেবা গ্রহণ করার পর মুক্তি দেয়া। তিন, শত্রুদের হাতে বন্দী নিজের লোকদের সাথে বিনিময় করা।

এসব বিবিধ পন্থা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন সময়ে সুযোগ মত আমল করেছেন। আল্লাহর দেয়া শরীয়াতী বিধান ইসলামী সরকারকে কোন একটি মাত্র উপায় ও পন্থার অনুসরণ বাধ্যতামূলক করে দেয়নি। সরকার যখন যে উপায় ও পন্থাটিকে সর্বাধিক উপযুক্ত মনে করবে সে পন্থা অনুসারে কাজ করতে পারে।

পাঁচ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) আচরণ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, একজন যুদ্ধবন্ধী যতক্ষণ সরকারের হাতে বন্দী থাকবে ততক্ষণ তার খাদ্য, পোশাক এবং অসুস্থ বা আহত হলে চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারের। বন্দীদের ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন রাখা কিংবা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার কোন বৈধতা ইসলামী শরীয়াতে নেই। বরং এর বিপরীত অর্থাৎ উত্তম আচরণ এবং বদান্যতামূলক ব্যবহার করার নির্দেশ যেমন দেয়া হয়েছে তেমনি নবীর বাস্তব কর্মকাণ্ডেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে বিভিন্ন সাহাবার পরিবারে বন্টন করে দিয়েছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, استوصوا بالاسارى خيرًا "এসব বন্দীদের সাথে ভাল আচরণ করবে।" তাদের মধ্যে একজন বন্দী ছিলেন আবু আযীয। তিনি বর্ণনা করেন ঃ "আমাকে যে আনসারদের পরিবারে রাখা হয়েছিল তারা আমাকে সকাল সন্ধ্যায় রুটি খেতে দিত। কিন্তু নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে থাকতো।" অন্য একজন বন্দী সুহাইল ইবনে আমর সম্পর্কে নবীকে (সা) জানানো হলো যে, সে একজন অনলবর্ষী বক্তা। সে আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতো। তার দাঁত উপড়িয়ে দিন। জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ "আমি যদি তার দাঁত উপড়িয়ে দেই তাহলে নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ আমার দাঁত উপড়িয়ে দেবেন।" (সীরাতে ইবনে হিশাম) ইয়ামামা অঞ্চলের নেতা সুমামা ইবনে উসাল বন্দী হয়ে আসলে সে বন্দী থাকা অবধি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে তার জন্য উত্তম খাদ্য ও দুধ সরবরাহ করা হতো। (ইবনে হিশাম) সাহাবায়ে কিরামের যুগেও এ কর্মপদ্ধতি চালু ছিল। তাঁদের যুগেও যুদ্ধবন্দীদের সাথে খারাপ আচরণের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

ছয় ঃ বন্দীদের স্থায়ীভাবে বন্দী করে রাখতে হবে—এবং সরকার তাদের থেকে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করতে থাকবে ইসলাম এমন ব্যবস্থা আদৌ রাখেনি। যদি তাদের সাথে অথবা তাদের জাতির সাথে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের অথবা মুক্তিপণ আদায়ের কোন ব্যবস্থা না হয় সে ক্ষেত্রে তাদের প্রতি ইহসান করার যে পন্থা রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, তাদেরকে দাস বানিয়ে ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে এবং তাদের মালিকদের নির্দেশ দিতে হবে যে, তারা যেন তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও এ নীতি অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে, সাহাবায়ে কিরামের যুগেও তা চালু ছিল এবং তা জায়েয হওয়া সম্পর্কে মুসলিম ফিকাহবিদগণ সর্বসম্মতিক্রমে মত প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি জানা থাকা দরকার তাহলো এই যে, বন্দী হওয়ার পূর্বেই যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং পরে কোনভাবে বন্দী

হয়েছে তাকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দেয়া হবে। কিন্তু কেউ বন্দী হওয়ার পরে ইসলাম গ্রহণ করলে, অথবা কোন ব্যক্তির মালিকানাধীনে দিয়ে দেয়ার পরে মুসলমান হলে এভাবে ইসলাম গ্রহণ তার মুক্তির কারণ হতে পারে না। মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম এবং তিরমিযী হাদীস গ্রন্থে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, বনী উকাইল গোত্রের এক ব্যক্তি বন্দী হয়ে আসলো এবং বললো যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

لَو قُلتَهَا وَاَنتَ تَملكُ اَمرَكَ اَفلَحتَ كُلَّ الفَلَاحِ

"যখন তুমি স্বাধীন ছিলে তখন যদি একথাটি বলতে তাহলে তুমি নিসন্দেহে সফলকাম হতে।"

হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

اذا اسلم الاسير فى ايدى المسلمين فقد امن من القتل وهو رقيق –

"বন্দী যদি মুসলমানদের হাতে পড়ার পরে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে, তবে দাস থেকে যাবে।"

এরই ওপরে ভিত্তি করে মুসলিম ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বন্দী হওয়ার পরে ইসলাম গ্রহণকারী দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে না। (আস সিয়ারুল কাবীর, ইমাম মুহাম্মাদ) একথাটি অত্যন্ত যুক্তিসংগতও বটে। কারণ, আমাদের আইন যদি এমন হতো যে, বন্দী হওয়ার পর যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করবে তাকেই মুক্ত করে দেয়া হবে তাহলে কালেমা পড়ে মুক্তি লাভ করতো না এমন কোন নির্বোধ বন্দী কি পাওয়া যেতো?

সাত ঃ ইসলামে বন্দীদের প্রতি ইহসান করার তৃতীয় যে পন্থাটি আছে তা হচ্ছে, জিযিয়া আরোপ করে তাদেরকে দারুল ইসলামের যিম্মী (নিরাপত্তা প্রদত্ত) নাগরিক বানিয়ে নেয়া। এভাবে তারা ইসলামী রাষ্ট্রে ঠিক তেমনি স্বাধীনতা নিয়ে থাকবে যেমন মুসলমানরা থাকে। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর 'আস সিয়ারুল কাবীর' নামক গ্রন্থে লিখছেন ঃ "যেসব ব্যক্তিকে দাস বানানো বৈধ তাদের প্রত্যেকের ওপর জিযিয়া আরোপ করে যিম্মী নাগরিক বানানোও বৈধ।" অন্য এক স্থানে লিখছেন ঃ "তাদের ওপর জিযিয়া এবং তাদের ভূমির ওপর ভূমিকর আরোপ করে তাদেরকে প্রকৃতই স্বাধীন ও মুক্ত করে দেয়ার অধিকার মুসলমানদের শাসকের আছে।" বন্দী লোকেরা যে অঞ্চলের অধিবাসী সে অঞ্চল বিজিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হলে সে পরিস্থিতিতে সাধারণত এ নীতি–পদ্ধতি অনুসারে কাজ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, খায়বারের অধিবাসীদের বেলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে শহর এলাকার বাইরে ইরাকের প্রত্যন্ত অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর হযরত উমর (রা) ব্যাপকভাবে এ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। আবু উবায়েদ কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইরাক বিজিত হওয়ার পর সে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধি

দল হযরত উমরের (রা) দরবারে হাজির হয়ে আবেদন জানালো যে, আমীরুল মু'মিনীন! ইতিপূর্বে ইরানবাসীরা আমাদের ঘাড়ে চেপেছিল। তারা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে, আমাদের সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে এবং আমাদের ওপর নানাভাবে বাড়াবাড়ি ও জুলুম করেছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন আপনাদের পাঠালেন তখন আপনাদের আগমনে আমরা খুব খুশী হলাম এবং আপনাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলিনি কিংবা যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করিনি। এখন আমরা শুনছি যে, আপনি আমাদের দাস বানিয়ে নিতে চাচ্ছেন। হযরত উমর (রা) জবাব দিলেন ঃ তোমাদের স্বাধীনতা আছে, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, কিংবা জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়ে স্বাধীন হয়ে যাও। ঐ সব লোক জিযিয়া প্রদান করতে স্বীকৃত হন এবং তাদেরকে স্বাধীন থাকতে দেয়া হয়। উক্ত গ্রন্থেরই আরো এক স্থানে আবু উবায়েদ বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) হযরত আবু মূসা আশ'আরীকে লিখেন, যুদ্ধে যাদের বন্দী করা হয়েছে তাদের মধ্য থেকে কৃষকদের প্রত্যেককে ছেড়ে দাও।"

আট ঃ ইহসান করার চতুর্থ পন্থা হলো কোন প্রকার মুক্তিপণ বা বিনিময় না নিয়েই বন্দীকে ছেড়ে দেয়া। এটি একটি বিশেষ অনুকম্পা। বিশেষ কোন বন্দীর অবস্থা যখন এরূপ অনুকম্পা প্রদর্শনের দাবী করে কিংবা যদি আশা থাকে যে, এ অনুকম্পা সে বন্দীকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবে এবং সে শত্রু না থেকে বন্ধু এবং কাফের না থেকে মু'মিন হয়ে যাবে তাহলে কেবল সে অবস্থায়ই ইসলামী সরকার তা করতে পারে। অন্যথায় এ বিষয়টি সর্বজন বিদিত যে, মুক্তিলাভ করার পর সে পুনরায় আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসবে এ জন্য শত্রু কওমের কোন ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়া কোনক্রমেই যুক্তির দাবী হতে পারে না। এ কারণেই মুসলিম ফিকাহবিদগণ ব্যাপকভাবে এর বিরোধিতা করেছেন এবং এর বৈধতার জন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, যদি মুসলমানদের ইমাম বন্দীদের সবাইকে কিংবা তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে ইহসান বা অনুকম্পার ভিত্তিতে ছেড়ে দেয়া যুক্তিসংগত মনে করেন তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। (আস সিয়ারুল কাবীর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর প্রায় সব ক্ষেত্রেই যৌক্তিকতা ও উপকারিতার দিকটি সুস্পষ্ট।

বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে নবী (সা) বলেছেন ঃ

لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هولاء النتنى لتركتهم له -

"মুতইম ইবনে আদ্দী যদি জীবিত থাকতো আর সে এসব জঘন্য লোকগুলো সম্পর্কে আমার সাথে আলোচনা করতো তাহলে আমি তার খাতিরে এদের ছেড়ে দিতাম।"
(বুখারী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা এ জন্য বলেছিলেন যে, তিনি যে সময় তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরেছিলেন সে সময় মুতইমই তাঁকে নিজের আশ্রয়ে নিয়েছিলেন এবং তার ছেলে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিজের হিফাজতে তাঁকে হারাম শরীফে নিয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি এভাবে তার ইহসানের প্রতিদান দিতে চাচ্ছিলেন।

বুখারী, মুসলিম এবং মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়ামামার নেতা সুমামা ইবনে উসাল বন্দী হয়ে আসলে নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সুমামা, তোমার বক্তব্য কি? সে বললো ঃ "আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবেন ঃ যার রক্তের কিছু মূল্য আছে, যদি আমার প্রতি ইহসান করেন তাহলে এমন এক ব্যক্তির প্রতি ইহসান করা হবে যে ইহসান স্বীকার করে। আর যদি আপনি অর্থ চান তাহলে তা আপনাকে প্রদান করা হবে।" তিনদিন পর্যন্ত তিনি তাকে একথাটিই জিজ্ঞেস করতে থাকলেন আর সে–ও একই জবাব দিতে থাকলো। অবশেষে তিনি সুমামাকে ছেড়ে দিতে আদেশ দিলেন। মুক্তি পাওয়া মাত্র সে নিকটবর্তী একটি খেজুরের বাগানে গিয়ে গোসল করে ফিরে আসলো এবং কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে বললো, আজকের দিনের আগে আমার কাছে আপনার চেয়ে কোন ব্যক্তি এবং আপনার দীনের চেয়ে কোন দীন অধিক ঘৃণিত ছিল না। কিন্তু এখন আমার কাছে আপনার চেয়ে কোন ব্যক্তি এবং আপনার দীনের চেয়ে কোন দীন অধিক প্রিয় নয়। এরপরে সে উমরা করার জন্য মক্কা গেল এবং সেখানে কুরাইশদের জানিয়ে দিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আজকের দিনের পরে ইয়ামামা থেকে কোন শস্য তোমরা পাবে না। সে প্রকৃতপক্ষে তাই করলো। ফলে মক্কাবাসীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আবেদন জানাতে হলো, তিনি যেন ইয়ামামা থেকে তাদের রসদ বন্ধ করিয়ে না দেন।

বনু কুরাইযার বন্দীদের মধ্য থেকে তিনি যাবীর ইবনে বাতা এবং আমর ইবনে সা'দ (অথবা ইবনে সু'দা) এর মৃত্যুদণ্ড রহিত করে দিলেন। তিনি যাবীরকে মুক্তি দিলেন এ কারণে যে, জাহেলী যুগে বুআস যুদ্ধের সময় সে হযরত সাবেত ইবনে কায়েসকে আশ্রয় দিয়েছিল। তাই তিনি তাকে সাবেতের হাতে তুলে দিলেন যাতে তিনি তাকে তাঁর প্রতি কৃত ইহসানের প্রতিদান দিতে পারেন। আর আমর ইবনে সা'দকে ছেড়েছিলেন এ জন্য যে, বনী কুরাইযা গোত্র যখন নবীর (সা) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছিল সে সময় এ ব্যক্তিই তার গোত্রকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে নিষেধ করেছিলো। (কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ)

বনী মুসতালিক যুদ্ধের পর যখন উক্ত গোত্রের বন্দীদের এনে সবার মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলো তখন হযরত জুয়াইরিয়া যার অংশে পড়েছিলেন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার বিনিময় দিয়ে মুক্ত করলেন এবং এরপর নিজেই তাকে বিয়ে করলেন। এতে সমস্ত মুসলমান তাদের অংশের বন্দীদেরও মুক্ত করে দিলেন। কারণ, এখন তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়। এভাবে একশ'টি পরিবারের ব্যক্তিবর্গ মুক্তি লাভ করলো। (মুসনাদে আহমাদ, তাবকাতে ইবনে সা'দ, সীরাতে ইবনে হিশাম)

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মক্কার ৮০ ব্যক্তি তানয়ীমের দিকে এগিয়ে আসে এবং ফজরের নামাযের সময় তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্যাম্পে আকস্মিক আক্রমণ চালানোর সংকল্প করে। তাদের সবাইকে বন্দী করা হয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে ছেড়ে দেন যাতে এ নাজুক পরিস্থিতিতে এ বিষয়টি যুদ্ধের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

মক্কা বিজয়ের সময় কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত সকলকে তিনি অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যাদের বাদ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যেও তিন চারজন ছাড়া কাউকে হত্যা করা হয়নি। মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের ওপর কিভাবে জুলুম করেছিল তা আরবরা সবাই জানতো। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করার পর যে মহত উদারতার সাথে নবী (সা) তাদের ক্ষমা করেছিলেন তা দেখে আরববাসীরা অন্তত এতটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলো যে, তাদের মোকাবিলা কোন নিষ্ঠুর ও কঠোর হৃদয় জালেমের সাথে নয়, বরং অত্যন্ত দয়াবান ও উদার নেতার সাথে। এ কারণেই মক্কা বিজয়ের পর গোটা আরব উপদ্বীপ অনুগত হতে দু'বছর সময়ও লাগেনি।

হুনায়েন যুদ্ধের পর হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল তাদের বন্দীদের মুক্ত করার জন্য যখন হাযির হলো তখন সমস্ত বন্দীদের বন্টন করা হয়ে গিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মুসলমানকে একত্রিত করে বললেন ঃ এরা সবাই তাওবা করে হাযির হয়েছে। আমার মত হলো তাদের বন্দীদের তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোক। তোমাদের মধ্যে যে তার অংশের বন্দীকে বিনিময় ছাড়াই সন্তুষ্ট চিত্তে ছেড়ে দিতে চায় সে যেন তাই করে। আর যে এর বিনিময় চায় তাকে আমি বায়তুলমালে সর্বপ্রথম যে অর্থ আমদানী হবে তা থেকে পরিশোধ করে দেব। এভাবে ছয় হাজার বন্দীকে মুক্ত করে দেয়া হলো যারা বিনিময় চেয়েছিলো সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বিনিময় প্রদান করা হলো। (বুখারী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, তাবকাতে ইবনে সা'দ) এ থেকে এ বিষয়টিও জানা গেল যে, বন্টিত হওয়ার পর সরকার নিজে বন্দীদের মুক্ত করে দেয়ার অধিকার রাখে না বরং বন্দীদেরকে যেসব লোকের মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের সম্মতির ভিত্তিতে অথবা বিনিময় দিয়ে তা করা যেতে পারে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে সাহাবীদের যুগেও ইহসান করে বন্দীদের মুক্তি দান করার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হযরত আবু বকর (রা) আশয়াস ইবনে কায়েস কিন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং হযরত উমর (রা) হুরমুযানকে এবং মানাযির ও মায়সানের বন্দীদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। (কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ)

নয় ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে অর্থের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দেয়ার দৃষ্টান্ত কেবল বদর যুদ্ধের সময় দেখা যায়। সে সময় একেকজন বন্দীকে এক হাজার থেকে ৪ হাজার পর্যন্ত মুদ্রা নিয়ে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। (তাবকাতে ইবনে সা'দ, কিতাবুল আমওয়াল) সাহাবায়ে কিরামের যুগে এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। মুসলিম ফিকাহবিদগণ ব্যাপকভাবে এরূপ করা অপছন্দ করেছেন। কারণ, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমরা অর্থের বিনিময়ে শত্রুদের কাউকে ছেড়ে দেব আর সে পুনরায় আমাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবে। তবে কুরআন মজীদে যেহেতু মুক্তিপণ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সে অনুযায়ী আমল করেছেন, তাই এ কাজ একেবারে নিষিদ্ধ নয়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) আস সিয়ারুল কাবীর গ্রন্থে বলেন ঃ "প্রয়োজন দেখা দিলে মুসলমানরা অর্থের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দিতে পারেন।"

দশ ঃ যুদ্ধবন্দীদেরকে কোন সেবা গ্রহণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়ার দৃষ্টান্তও বদর যুদ্ধের সময় দেখা যায়। কুরাইশ বন্দীদের মধ্যে যাদের আর্থিক মুক্তিপণ দেয়ার ক্ষমতা ছিল না

তাদের মুক্তি দেয়ার জন্য নবী (সা) শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, তারা আনসারদের দশজন করে শিশুকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেবে। (মুসনাদে আহমাদ, তাবকাতে ইবনে সা'দ, কিতাবুল আমওয়াল)

এগার ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা বন্দী বিনিময়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। একবার নবী (সা) হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি অভিযানে পাঠালেন। এতে কয়েকজন বন্দী হয়ে আসলো। তাদের মধ্যে জনৈকা পরমা সুন্দরী নারীও ছিল। সে সালামা ইবনুল আকওয়ার অংশে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার্কে বার বার বলে মহিলাকে চেয়ে নিলেন এবং তাকে মক্কায় পাঠিয়ে তার বিনিময়ে বহু মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করালেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তাহাবী, কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ, তাবকাতে ইবনে সা'দ) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেন ঃ একবার সাকীফ গোত্র দু'জন মুসলমানকে বন্দী করে। এর কিছুদিন পর সাকীফের মিত্র বনী উকাইলের এক ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। নবী (সা) তাকে তায়েফে পাঠিয়ে তার বিনিময়ে ঐ দু'জন মুসলমানকে মুক্ত করে আনেন। (মুসলিম, তিরমিযি, মুসনাদে আহমাদ) ফিকাহবিদদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদের মতে বন্দী বিনিময় জায়েয। ইমাম আবু হানীফার একটি মত হচ্ছে, বিনিময় না করা উচিত। কিন্তু তাঁরও দ্বিতীয় মত হচ্ছে বিনিময় করা যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, বন্দীদের যে মুসলমান হয়ে যাবে বিনিময়ের মাধ্যমে তাকে কাফেরদের হাতে তুলে দেয়া যাবে না।

এ ব্যাখ্যার দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের জন্য এমন একটি ব্যাপক আইন রচনা করেছে যার মধ্যে প্রত্যেক যুগে এবং সব রকম পরিস্থিতিতে এ সমস্যার মোকাবিলা করার অবকাশ আছে। যারা কুরআন মজীদের এ আয়াতটির শুধু এ সংক্ষিপ্ত অর্থ গ্রহণ করে যে, যুদ্ধবন্ধীদেরকে ইহসান বা অনুকম্পা করে ছেড়ে দিতে হবে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে তারা জানে না যুদ্ধবন্দী সম্পর্কিত বিষয়টির কত ভিন্ন ভিন্ন দিক থাকতে পারে এবং বিভিন্ন যুগে তা কত সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে পারে।

৯. অর্থাৎ বাতিলের পূজারীদের মাথা চূর্ণ করাই যদি আল্লাহ তা'আলার একমাত্র কাজ হতো তাহলে তা করার জন্য তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী হতেন না। তাঁর সৃষ্ট ভূমিকম্প বা ঝড়–তুফান চোখের পলকেই এ কাজ করতে পারতো। কিন্তু তিনি চান মানুষের মধ্যে যারা ন্যায় ও সত্যের অনুসারী তারা বাতিলের অনুসারীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হোক এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুক। যাতে যার মধ্যে যে গুণাবলী আছে তা এ পরীক্ষায় সুন্দর ও পরিমার্জিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকেই তার কর্মের বিচারে যে অবস্থান ও মর্যাদালাভের উপযুক্ত তাকে তা দেয়া যায়।

১০. অর্থাৎ আল্লাহর পথে কারো নিহত হওয়ার অর্থ এ নয় যে, কেউ নিহত হলেই তার ব্যক্তিগত সব কাজ–কর্মই ধ্বংস হয়ে গেল। কেউ যদি একথা মনে করে যে, শহীদদের ত্যাগ ও কুরবানী তাদের নিজেদের জন্য উপকারী নয় বরং তাদের পরে যারা এ পৃথিবীতে জীবিত থাকলো এবং তাদের ত্যাগ ও কুরবানী দ্বারা লাভবান হলো তারাই শুধু

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا
مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۡ وَلِلْكٰفِرِيْنَ
اَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى
لَهُمْ ﴿١١﴾

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন[১২] এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দিবেন। যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে শুধু ধ্বংস।[১৩] আল্লাহ তাদের কাজ-কর্ম পণ্ড করে দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ যে জিনিস নাযিল করেছেন তারা সে জিনিসকে অপছন্দ করেছে।[১৪] অতএব, আল্লাহ তাদের আমলসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে সেসব লোকের পরিণাম দেখে না, যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এসব কাফেরের জন্যও অনুরূপ পরিণাম নির্ধারিত হয়ে আছে।[১৫] এর কারণ, আল্লাহ নিজে ঈমান গ্রহণকারীদের সহযোগী ও সাহায্যকারী। কিন্তু কাফেরদের সহযোগী ও সাহায্যকারী কেউ নেই।[১৬]

কল্যাণ লাভ করলো তাহলে ভুল বুঝছে। প্রকৃত সত্য হলো যারা শাহাদাতলাভ করলো তাদের নিজেদের জন্যও এটি লোকসানের নয় লাভের বাণিজ্য।

১১. এটিই সেই মুনাফা যা আল্লাহর পথে জীবনদানকারীরা লাভ করবে তাদের তিনটি মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এক, আল্লাহ তাদের পথপ্রদর্শন করবেন। দুই, তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন। তিন, তিনি তাদেরকে সেই বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যার সম্পর্কে তিনি পূর্বেই তাদের অবহিত করেছেন। এখানে পথপ্রদর্শনের অর্থ স্পষ্টত জান্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করা। অবস্থা সংশোধন করার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত পোশাকে সজ্জিত করে সেখানে নিয়ে যাবেন এবং পার্থিব জীবনে যেসব কলুষ কালিমা তাদের লেগেছিল তা বিদূরিত করবেন। আর তৃতীয় মর্যদাটির অর্থ হচ্ছে কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানীতে তাদেরকে ইতিপূর্বেই দুনিয়াতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

আল্লাহ ঈমান গ্রহণকারী ও সৎকর্মশীলদের সে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বয়ে যায়। আর কাফেররা দুনিয়ার ক'দিনের জীবনের মজা লুটছে, জন্তু-জানোয়ারের মত পানাহার করছে।[১৭] ওদের চূড়ান্ত ঠিকানা জাহান্নাম।

হে নবী, অতীতের কত জনপদ তো তোমার সে জনপদ থেকে অধিক শক্তিশালী ছিল, যারা তোমাকে বের করে দিয়েছিল। আমি তাদের এমনভাবে ধ্বংস করেছি যে, তাদের কোন রক্ষাকারী ছিল না।[১৮]

জন্য যে জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন তা কেমন। তারা যখন সে জান্নাতে গিয়ে পৌঁছবে তখন সম্পূর্ণরূপে নিজেদের পরিচিত জিনিসের মধ্যে প্রবেশ করবে। তারা তখন জানতে পারবে, তাদেরকে যে জিনিস দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল ঠিক তাই তাদের দেয়া হয়েছে। তাতে সামান্যতম পার্থক্যও নেই।

১২. আল্লাহকে সাহায্য করার একটা সাদামাঠা অর্থ হচ্ছে তার বাণী ও বিধানকে সমুন্নত করার জন্যে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করতে হবে। কিন্তু এর একটি গূঢ় দুর্বোধ্য অর্থও আছে। আমরা ইতিপূর্বে তার ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরানের ব্যাখ্যা, টীকা ৫০)

১৩. মূল কথাটি হলো فَتَعْسًا لَّهُمْ । تعس অর্থ হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়া।

১৪. অর্থাৎ তারা নিজেদের প্রাচীন জাহেলী ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি ও নৈতিক বিকৃতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং তাদেরকে সোজা পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ যে শিক্ষা নাযিল করেছেন তা অপছন্দ করেছে।

১৫. এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, এসব কাফেররা যে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিল এখন যে কাফেররা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত মানছে না তাদের জন্যও ঠিক অনুরূপ শাস্তি নির্ধারিত হয়ে আছে। অন্য একটি অর্থ হচ্ছে, শুধু দুনিয়ার আযাব দ্বারাই তাদের ধ্বংসের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। আখেরাতেও তাদের জন্য এ ধ্বংস নির্ধারিত হয়ে আছে।

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴿١٤﴾ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

এমনকি কখনো হয়, যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট হিদায়াতের ওপর আছে সে ঐ সব লোকের মত হবে যাদের মন্দ কাজকর্মকে সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে গিয়েছে?[১৯] *মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার অবস্থা এই যে, তার মধ্যে স্বচ্ছ ও নির্মল পানির নহর বইতে থাকবে।*[২০] *এমন সব দুধের নহর বইতে থাকবে যার স্বাদে সামান্য কোন পরিবর্তন বা বিকৃতিও আসবে না,*[২১] *শরাবের এমন নহর বইতে থাকবে পানকারীদের জন্য যা হবে অতীব সুস্বাদু*[২২] *এবং বইতে থাকবে স্বচ্ছ মধুর নহর।*[২৩] *এ ছাড়াও তাদের জন্য সেখানে থাকবে সব রকমের ফল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে থাকবে ক্ষমা।*[২৪] *(যে ব্যক্তি এ জান্নাত লাভ করবে সেকি) ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে যে চিরদিন জাহান্নামে থাকবে, যাদের এমন গরম পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে?*

১৬. ওহুদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আহত হয়ে কয়েকজন সাহাবীর সাথে পাহাড়ের এক গুহায় অবস্থান করছিলেন তখন আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বললো ঃ لَنَا عُزَّىٰ وَلاَ عُزَّىٰ لَكُمْ "আমাদের আছে উয্যা দেবতা, তোমাদের তো উয্যা নেই।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের বললেন ঃ তাকে জবাব দাও اَللّٰهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلٰى لَكُمْ "আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী আল্লাহ কিন্তু তোমাদের কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী নেই।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ জবাবটি এ আয়াত থেকেই গৃহীত।

১৭. অর্থাৎ জীবজন্তু যেভাবে খায় অথচ আদৌ চিন্তা করে না যে, এ রিযিক কোথা থেকে এসেছে, কে তা তৈরী করেছে এবং এ রিযিকের সাথে সাথে তার ওপর

রিযিকদাতার কি কি অধিকার বর্তাচ্ছে? ঠিক তেমনি এসব লোকও শুধু খেয়ে চলেছে। চরে বেড়ানোর অধিক আর কোন জিনিসই তাদের চিন্তায় নেই।

১৮. মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে বড় দুঃখ ছিল। তিনি যখন হিজরত করতে বাধ্য হলেন তখন শহরের বাইরে গিয়ে তিনি শহরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "হে মক্কা! আল্লাহর কাছে তুমি দুনিয়ার সব শহরের চেয়ে প্রিয়। আর আল্লাহর সমস্ত শহরের মধ্যে আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। যদি মুশরিকরা আমাকে বের করে না দিতো তাহলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।" এ কারণে বলা হয়েছে যে, তোমাকে বহিষ্কার করে মক্কাবাসীরা মনে করছে যে, তারা বড় রকমের সফলতা লাভ করেছে। অথচ এ আচরণের দ্বারা তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। আয়াতটির বাচনভঙ্গি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, তা অবশ্যম্ভাবী রূপে হিজরতের পরপরই নাযিল হয়ে থাকবে।

১৯. অর্থাৎ এটা কি কিরে সম্ভব যে, নবী এবং তাঁর অনুসারীগণ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট ও সোজা পথ লাভ করেছেন এবং পূর্ণ দূরদৃষ্টির আলোকে তাঁরা তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তখন সেসব লোকদের সাথে চলবেন যারা পুরনো জাহেলিয়াতকে আঁকড়ে ধরে আছে, যারা নিজেদের গোমরাহীকে হিদায়াত এবং কুকর্মকে উত্তম মনে করছে এবং যারা কোন যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে নয়, বরং নিজেদের প্রবৃত্তির ইচ্ছানুসারে কোন্‌টি হক এবং কোন্‌টি বাতিল তার ফায়সালা করে থাকে। তাই এ দুই গোষ্ঠীর জীবন এখন দুনিয়াতে যেমন এক রকম হতে পারে না, তেমনি আখেরাতেও তাদের পরিণাম এক রকম হতে পারে না।

২০. মূল বাক্যাংশ হচ্ছে مَاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ । اسن বলা হয় এমন পানিকে যার স্বাদ ও বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে অথবা যার মধ্যে কোনভাবে গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত পৃথিবীর সমুদ্র ও নদীর পানি ঘোলা হয়ে থাকে। তার সাথে বালু, মাটি এবং মাঝে মধ্যে নানা রকম উদ্ভিদরাজি মিশে যাওয়ার কারণে বর্ণ ও স্বাদ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তাতে কিছু না কিছু দুর্গন্ধও সৃষ্টি হয়। তাই জান্নাতের সমুদ্র ও নদীসমূহের পানির পরিচয় দেয়া হয়েছে এই যে, তা হবে غير اسن অর্থাৎ নির্ভেজাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পানি। তার মধ্যে কোন প্রকার সংমিশ্রণ থাকবে না।

২১. মারফূ' হাদীসে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই যে, "তা পশুর বাঁট বা স্তন থেকে নির্গত দুধ হবে না।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ দুধ ঝর্ণার আকারে মাটি থেকে বের করবেন এবং নদীর আকারে প্রবাহিত করবেন। পশুর পালান বা বাঁট থেকে দোহন করে তারপর জান্নাতের নদীসমূহে ঢেলে প্রবাহিত করা হবে এমন নয়। এ কুদরতী দুধের পরিচয়ে বলা হয়েছে, "তার স্বাদে কোন পরিবর্তন আসবে না" অর্থাৎ পশুর পালান থেকে নির্গত দুধে যে এক ধরনের গন্ধ থাকে, তার লেশমাত্রও এতে থাকবে না।

২২. মারফূ' হাদীসে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই যে, "পদদলন বা মাড়ানো দ্বারা ঐ শরাব নির্গত হবে না" অর্থাৎ সে শরাব দুনিয়ার সাধারণ মদের মত ফল পঁচিয়ে পায়ে মাড়িয়ে নির্গত করা হবে না। বরং এটাও আল্লাহ তা'আলা ঝর্ণার আকারে সৃষ্টি করবেন এবং নদী-নালার আকারে প্রবাহিত করবেন। এর পরিচয় দিতে গিয়ে আরো বলা হয়েছে,

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা মনযোগ দিয়ে তোমার কথা শোনে এবং যখন তোমার কাছ থেকে চলে যায় তখন যাদেরকে জ্ঞানের নিয়ামত দান করা হয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করে যে, এই মাত্র তিনি কি বললেন?[২৫] এরাই সেসব লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে গিয়েছে।[২৬]

"তা হবে পানকারীদের জন্য অতীব সুস্বাদু।" অর্থাৎ তা দুনিয়ার মদের মত তীব্র এবং গন্ধযুক্ত হবে না। দুনিয়ার মদ তো এমন যে, যত বড় অভ্যস্ত মদখোরই তা পান করুক, মুখ বিকৃত না করে পান করতে পারে না।

সূরা সাফ্‌ফাতে এর আরো পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে যে, তা পান করায় শরীরের কোন ক্ষতিও হবে না এবং বুদ্ধি বিভ্রমও ঘটবে না। (আয়াত ৪৭) সূরা ওয়াকিআতে বলা হয়েছে যে, তার কারণে মাথাও ধরবে না কিংবা ব্যক্তির বিবেকও লুপ্ত হবে না। (আয়াত ১৯) এ থেকে জানা গেল যে, তা মাদকতাপূর্ণ হবে না, বরং শুধু স্বাদ ও আনন্দই দান করবে।

২৩. মারফূ' হাদীসে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই যে, তা মৌমাছির পেট থেকে নির্গত মধু হবে না অর্থাৎ ঐ মধুও ঝর্ণা থেকে নির্গত হবে এবং নদী–নালায় প্রবাহিত হবে। সুতরাং তার মধ্যে মোম, মৌচাকের টুকরা এবং মৃত মৌমাছির পা মিশে থাকবে না। বরং তা হবে নিখাদ ও নির্ভেজাল মধু।

২৪. জান্নাতের এসব নিয়ামতের উল্লেখের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার উল্লেখ করার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এসব নিয়ামতের চেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, পৃথিবীতে তাদের দ্বারা যেসব ত্রুটি–বিচ্যুতি হয়েছিল জান্নাতে তাদের সামনে কখনো তার উল্লেখ পর্যন্ত করা হবে না। বরং যাতে তারা জান্নাতে লজ্জিত না হন সে জন্য আল্লাহ তাদের ঐ সব ত্রুটি–বিচ্যুতির ওপর চিরদিনের জন্য পর্দা টেনে দেবেন।

২৫. কাফের, মুনাফিক ও আহলে কিতাবদের মধ্যকার যেসব আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে এসে বসতো, তাঁর বাণী ও নির্দেশাবলী এবং কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ শুনতো তাদের সম্পর্কেই একথা বলা হয়েছে। নবীর (সা) পবিত্র মুখ থেকে যেসব বিষয়ে কথাবার্তা উচ্চারিত হতো তার সাথে তাদের যেহেতু

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٨﴾ فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾

আর যারা হিদায়াত লাভ করেছে আল্লাহ তাদেরকে আরো অধিক হিদায়াত দান করেন।[২৭] এবং তাদেরকে তাদের অংশের তাকওয়া দান করেন।[২৮] এখন কি এসব লোক শুধু কিয়ামতের জন্যই অপেক্ষা করছে যে, তা তাদের ওপর অকস্মাৎ এসে পড়ুক।[২৯] তার আলামত তো এসে গিয়েছে।[৩০] যখন কিয়ামতই এসে যাবে তখন তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণের আর কি অবকাশ থাকবে?

অতএব, হে নবী! ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয়। নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। এবং মু'মিন নারী ও পুরুষদের জন্যও।[৩১] আল্লাহ তোমাদের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত এবং তোমাদের ঠিকানা সম্পর্কেও অবহিত।

দূরতম সম্পর্কও ছিল না, তাই তারা সবকিছু শুনেও যেন শুনতো না। এ কারণে বাইরে এসেই মুসলমানদের জিজ্ঞেস করতো, এই মাত্র তিনি কি যেন বলছিলেন?

২৬. তাদের অন্তরের কান যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী শোনার ব্যাপারে বধির হয়ে গিয়েছিলো। এটিই ছিল তার প্রকৃত কারণ। তারা ছিল নিজেদের প্রবৃত্তির দাস। অথচ নবী (সা) যেসব শিক্ষা পেশ করছিলেন তা ছিল তাদের প্রবৃত্তির দাবীর পরিপন্থী। তাই যদিও কোন সময় তারা নবীর (সা) মজলিসে এসে তাঁর কথা শোনার ভান করলেও আসলে তাদের ঝুলিতে কিছুই পড়তো না।

২৭. অর্থাৎ সে একই কথা যা হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের জন্য আরো হিদায়াতের কারণ হতো। অথচ তা শুনে কাফের ও মুনাফিকরা জিজ্ঞেস করতো যে, একটু আগে তিনি কি বলেছেন? যে মজলিস থেকে এ দুর্ভাগারা অযথা সময় নষ্ট করে উঠে যেতো, এ সৌভাগ্যবানরা সে মজলিস থেকেই জ্ঞানের এক নতুন ভাণ্ডার ভরে নিয়ে যেতো।

২৮. অর্থাৎ তারা নিজেদের মধ্যে যে তাকওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে তাওফীকই দান করেন।

২৯. অর্থাৎ ন্যায় ও সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার কাজটি তো যুক্তি–প্রমাণ, কুরআনের আলৌকিক বর্ণনা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দ্বারা অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন পন্থায় করা

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿۲۰﴾ طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۫ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۫ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿۲۱﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْۤا اَرْحَامَكُمْ ﴿۲۲﴾

৩ রুকূ'

যারা ঈমান আনয়ন করেছে তারা বলছিলো, এমন কোন সূরা কেন নাযিল করা হয় না (যাতে যুদ্ধের নির্দেশ থাকবে)? কিন্তু যখন সুস্পষ্ট নির্দেশ সম্বলিত সূরা নাযিল করা হলো এবং তার মধ্যে যুদ্ধের কথা বলা হলো তখন তোমরা দেখলে, যাদের মনে রোগ ছিল তারা তোমার প্রতি সে ব্যক্তির মত তাকাচ্ছে যার ওপর মৃত্যু চেপে বসেছে।[৩২] *তাদের এ অবস্থার জন্য আফসোস (তাদের মুখে) আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি এবং ভাল ভাল কথা। কিন্তু যখন অলংঘনীয় নির্দেশ দেয়া হলো তখন যদি তারা আল্লাহর সাথে কৃত নিজেদের অঙ্গীকারের ব্যাপারে সত্যবাদী প্রমাণিত হতো তাহলে তা তাদের জন্যই কল্যাণকর হতো। এখন তোমাদের থেকে এ ছাড়া অন্য কিছুর কি আশা করা যায় যে, তোমরা যদি ইসলাম থেকে ফিরে যাও*[৩৩] *তাহলে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং একে অপরের গলা কাটবে?*[৩৪]

হয়েছে। এখন ঈমান আনার জন্য এসব লোক কি কিয়ামতকে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে দেখে নেয়ার অপেক্ষা করছে?

৩০. কিয়ামতের আলামত বলতে সেসব আলামতকে বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, এখন কিয়ামতের আগমনের সময় ঘনিয়ে এসছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত হচ্ছে আল্লাহর শেষ নবীর আগমন যার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আনাস, হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী এবং হযরত বুরাইদা বর্ণিত হাদীসসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অংগুলি উঠিয়ে বললেন : بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ "আমার আগমন ও কিয়ামত এ দু' অঙ্গুলির মত।" অর্থাৎ দু'টি আংগুলের মধ্যে যেমন আর কোন আংগুল নেই তেমনি আমার ও কিয়ামতের মাঝে আর কোন নবী পাঠানো হবে না। আমার পরে এখন শুধু কিয়ামতেরই আগমন ঘটবে।

৩১. ইসলাম মানুষকে যেসব নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছে তার একটি হচ্ছে বান্দা তার প্রভুর বন্দেগী ও ইবাদাত করতে এবং তাঁর দীনের জন্য জীবনপাত করতে নিজের পক্ষ থেকে যত চেষ্টা–সাধনাই করুক না কেন, তার মধ্যে এমন ধারণা কখনো আসা উচিত নয় যে, তার যা করা উচিত ছিল তা সে করেছে। তার বরং মনে করা উচিত যে, তার ওপর তার মালিকের যে দাবী ও অধিকার ছিল তা সে পালন করতে পারেনি। তার উচিত সবসময় দোষ–ক্রটি স্বীকার করে আল্লাহর কাছে এ দোয়া করা যে, তোমার কাছে আমার যে ক্রটি–বিচ্যুতি ও অপরাধ হয়েছে তা ক্ষমা করে দাও। "হে নবী, তোমার ক্রটি–বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো" আল্লাহর এ আদেশের অর্থ এ নয় যে, নবী (সা) জেনে বুঝে প্রকৃতই কোন অপরাধ করেছিলেন। নাউযুবিল্লাহ! বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর সমস্ত বান্দার মধ্যে যে বান্দা তার রবের বন্দেগী বেশী করে করতেন নিজের এ কাজের জন্য তাঁর অন্তরেও গর্ব ও অহংকারের লেশমাত্র প্রবেশ করতে পারেনি। তাঁর মর্যাদাও ছিল এই যে, নিজের এ মহামূল্যবান খেদমত সত্ত্বেও তাঁর প্রভুর সামনে নিজের অপরাধ স্বীকারই করেছেন। এ অবস্থা ও মানসিকতার কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আবু দাউদ, নাসায়ী এবং মুসনাদে আহমাদের বর্ণিত হাদীসে নবীর (সা) এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, "আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে একশ' বার ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি।"

৩২. অর্থাৎ সে সময় মুসলমানরা যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলো এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে কাফেরদের যে আচরণ ছিল তার কারণে যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বেই মুসলমানদের সাধারণ মতামত ছিল এই যে, এখন আমাদের যুদ্ধের অনুমতি পাওয়া উচিত। তারা ব্যাকুল চিত্তে আল্লাহর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলো এবং বার বার জানতে চাচ্ছিলো যে, এ জালেমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে লড়াই করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না কেন? কিন্তু যারা মুনাফিকীর আবরণে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছিল। তাদের অবস্থা ছিল মু'মিনদের অবস্থা থেকে ভিন্ন। তারা তাদের প্রাণ ও অর্থ–সম্পদকে আল্লাহ ও তাঁর দীনের চেয়ে অনেক বেশী প্রিয় মনে করতো এবং সে ক্ষেত্রে কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল না। যুদ্ধের নির্দেশ আসা মাত্রই তাদেরকে এবং খাঁটি ঈমানদারদেরকে বাছাই করে পরস্পর থেকে আলাদা করে দিন। এ নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদের ও ঈমানদারদের মধ্যে বাহ্যিক কোন পার্থক্য দেখা যেতো না। তারা এবং এরা উভয়েই নামায পড়তো। রোযা রাখতেও তাদের কোন দ্বিধা–সংকোচ ছিল না। ঠাণ্ডা প্রকৃতির ইসলাম তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু যখন ইসলামের জন্য জীবন বাজি রাখার সময় আসলো তখন তাদের মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং ঈমানের লোক দেখানো যে মুখোশ তারা পরেছিল তা খুলে পড়লো। তাদের এ অবস্থা সূরা নিসায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "তোমরা কি সে লোকদের দেখেছো যাদের বলা হয়েছিলো, নিজের হাতকে সংযত রাখো, নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও। এখন তাদেরকে যখন যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন তাদের এক দলের অবস্থা এই যে, মানুষকে এমন ভয় পাচ্ছে যে ভয় আল্লাহকে করা উচিত। বরং তার চেয়েও বেশী ভয় পাচ্ছে। তারা বলছে ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে যুদ্ধের এ নির্দেশ কেন দিলে? আমাদেরকে আরো কিছু অবকাশ দিলে না কেন?" (আয়াত ৭৭)

৩৩. মূল কথাটি হলো اِنْ تَوَلَّيْتُمْ । এ বাক্যাংশের একটি অনুবাদ আমরা ওপরে করেছি। এর দ্বিতীয় অনুবাদ হচ্ছে, "যদি তোমরা মানুষের শাসক হয়ে যাও।"

৩৪. একথাটির একটি অর্থ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈমানদারগণ যে মহান সংস্কারমূলক বিপ্লবের জন্য চেষ্টা–সাধনা করছেন এ সময় তোমরা যদি ইসলামের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে টালবাহানা করো এবং সে মহান সংস্কারমূলক বিপ্লবের জন্য প্রাণ ও সম্পদের বাজি ধরা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে শেষ পর্যন্ত তার পরিণাম এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তোমরা আবার সেই জাহেলী জীবন ব্যবস্থার দিকে ফিরে যাবে যার ব্যবস্থাধীনে তোমরা শত শত বছর ধরে একে অপরের গলা কেটেছো, নিজেদের সন্তানদের পর্যন্ত জীবন্ত দাফন করেছো এবং আল্লাহর দুনিয়াকে জুলুম ও ফাসাদে ভরে তুলেছো। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমাদের জীবনাচার ও কর্মকাণ্ডের অবস্থা যখন এই যে, যে দীনের প্রতি ঈমান পোষণের কথা তোমরা স্বীকার করেছিলে তার জন্য তোমাদের মধ্যে কোন আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা নেই এবং তার জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতেও তোমরা প্রস্তুত নও। তাহলে এ নৈতিক অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করেন এবং পার্থিব সব কাজ–কর্মের দায়–দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পিত হয় তাহলে জুলুম–ফাসাদ এবং ভ্রাতৃঘাতি কাজ ছাড়া তোমাদের থেকে আর কি আশা করা যেতে পারে?

এ আয়াতটি একথাও স্পষ্ট করে দেয় যে, আয়াত ইসলামে 'আত্মীয়তার বন্ধন' ছিন্ন করা হারাম। অপরদিকে ইতিবাচক পন্থায় কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে আত্মীয়–স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহারকে বড় নেকীর কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, আল বাকারা, ৮৩; ১৭৭; আন নিসা, ৮–৩৬; আন নাহল, ৯০; বনী ইসরাইল, ২৬ এবং আন নূর, ২২ আয়াত। رحم শব্দটি আরবী ভাষায় রূপক অর্থে নৈকট্য ও আত্মীয়তা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কোন ব্যক্তির দূর ও নিকট সম্পর্কীয় সব আত্মীয়ই তার ذوى الارحام । তাদের যার সাথে যত নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক তার অধিকার তত বেশী এবং তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা তত বড় গোনাহ। আত্মীয়তা রক্ষা করার অর্থ হলো, আত্মীয়ের উপকার করার যতটুকু সামর্থ ব্যক্তির আছে তা করতে দ্বিধা না করা। আর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তির তার সাথে খারাপ ব্যবহার বা আচরণ করা, অথবা যে উপকার করা তার পক্ষে সম্ভব তা না করে পাশ কাটিয়ে চলা। হযরত উমর (রা) এ আয়াত থেকে প্রমাণ পেশ করে "উম্মে ওয়ালাদ" বা সন্তানের মা ক্রীতদাসীকে বিক্রি করা হারাম ঘোষণা করেছিলেন এবং সাহাবা কিরামের সবাই এতে ঐকমত্য প্রকাশ করেছিলেন। হাকেম মুসতাদরিক গ্রন্থে হযরত বুরাইদা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি হযরত উমরের (রা) মজলিসে বসেছিলেন। হঠাৎ মহল্লার মধ্যে চেঁচামেচি শুরু হলো। জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, এক ক্রীতদাসীকে বিক্রি করা হচ্ছে তাই তাঁর মেয়ে কাঁদছে। হযরত উমর (রা) সে মুহূর্তেই আনসার ও মুহাজিরদের একত্র করে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন তার মধ্যে আত্মীয়তা বা রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কোন বৈধতা কি আপনারা পেয়েছেন? সবাই জবাব দিলেন, 'না।' হযরত উমর (রা) বললেন ঃ তাহলে এটা

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

আল্লাহ তা'আলা এসব লোকের ওপর লা'নত করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দিয়েছেন। তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করেনি, নাকি তাদের মনের ওপর তালা লাগানো আছে?[৩৫] প্রকৃত ব্যাপার হলো, হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যারা তা থেকে ফিরে গেল শয়তান তাদের জন্য এরূপ আচরণ সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশাবাদকে দীর্ঘায়িত করে রেখেছে। এ কারণেই তারা আল্লাহর নাযিলকৃত দীনকে যারা পছন্দ করে না তাদের বলেছে, কিছু ব্যাপারে আমরা তোমাদের অনুসরণ করবো।[৩৬] আল্লাহ তাদের এ সলা–পরামর্শ ভাল করেই জানেন। সে সময় কি অবস্থা হবে যখন ফেরেশতারা তাদের রূহ কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর আঘাত করতে করতে নিয়ে যাবে।[৩৭] এসব হওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা এমন পন্থার অনুসরণ করেছে যা আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করা পছন্দ করেনি। এ কারণে তিনি তাদের সব কাজ–কর্ম নষ্ট করে দিয়েছেন।[৩৮]

কেমন কথা যে, আপনাদের এ সমাজেই মাকে তার মেয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে? এর চেয়ে বড় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নের কাজ আর কি হতে পারে? তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। সবাই বললো ত্রুটি রোধ করার জন্য আপনার মতে যে ব্যবস্থা উপযুক্ত মনে করেন তাই গ্রহণ করুন। সুতরাং হযরত উমর (রা) গোটা ইসলামী অঞ্চলে এই সাধারণ নির্দেশ জারী করে দিলেন, যে দাসীর গর্ভে তার মালিকের ঔরসজাত সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তাকে বিক্রি করা যাবে না। কারণ, এটা আত্মীয়তা বা রক্তের বন্ধন ছিন্ন করা। সুতরাং এ কাজ হালাল নয়।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾
وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ
وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ
لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

৪ রুকূ'

যেসব লোকের মনে রোগ আছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহ তাদের মনের ঈর্ষা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করবেন না? আমি চাইলে তাদেরকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিতাম আর তুমি তাদের চেহারা দেখেই চিনতে পারতে। তবে তাদের বাচনভঙ্গি থেকে তুমি তাদেরকে অবশ্যই চিনে ফেলবে। আল্লাহ তোমাদের সব আমল ভাল করেই জানেন। আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো যাতে আমি তোমাদের অবস্থা যাঁচাই করে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী এবং কে ধৈর্যশীল।

যারা কুফরী করেছে, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং তাদের সামনে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রসূলের সাথে বিরোধ করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং আল্লাহই তাদের সব কৃতকর্ম ধ্বংস করে দিবেন।[৩৯] *হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের আমল ধ্বংস করো না।*[৪০]

৩৫. অর্থাৎ হয় এসব লোক কুরআন মজীদ সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা ও গবেষণা করে না। কিংবা চিন্তা–ভাবনা করার চেষ্টা করে কিন্তু তার শিক্ষা এবং অর্থ ও তাৎপর্য তাদের মনের গভীরে প্রবেশ করে না। কেননা, তাদের হৃদয়–মনে তালা লাগানো আছে। বলা হয়েছে, "মনের ওপরে তাদের তালা লাগানো আছে" একথার অর্থ হচ্ছে, তাদের মনে এমন তালা লাগানো আছে যা ন্যায় ও সত্যকে চিনে না এমন লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট।

৩৬. অর্থাৎ ঈমান গ্রহণ করে মুসলমানদের দলে শামিল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে যড়যন্ত্র করে এসেছে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে যে, কিছু কিছু ব্যাপারে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবো।

৩৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে এ জন্য যাতে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে এবং কুফর ও ইসলামের যুদ্ধের বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর পরে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কোথায় গিয়ে রক্ষা পাবে? সে সময় তাদের কোন কৌশলই তাদেরকে ফেরেশতাদের মারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

যেসব আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে 'বরযখ' অর্থাৎ কবরের আযাব প্রমাণিত হয় এটি তার একটি। এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, মৃত্যুর সময় থেকেই কাফের ও মুনাফিকদের আযাব শুরু হয়ে যায়। কিয়ামতে তাদের মোকদ্দমার ফায়সালা হওয়ার পর যে শাস্তি দেয়া হবে এ আযাব তা থেকে ভিন্ন জিনিস। আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আন নিসা, ৯৭ আয়াত; আল আনআম, ৯৩–৯৪; আল আনফাল, ৫০; আন্ নাহল, ২৮–৩২; আল মু'মিনূন। ৯৯–১০০; ইয়াসীন ২৬–২৭ এবং টীকা ২২–২৩ এবং আল মু'মিন ৪৬, টীকা ৬২ সহ।

৩৮. কাজ–কর্ম অর্থ সেসব কাজ যা তারা মুসলমান সেজে করেছে। তাদের নামায, রোযা, যাকাত মোটকথা সেসব ইবাদাত–বন্দেগী ও নেকীর কাজসমূহ যা বাহ্যিকভাবে নেকীর কাজ বলে গণ্য হতো। এসব নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে তারা মুসলমান হয়েও, আল্লাহ, তার দীন এবং ইসলামী মিল্লাতের সাথে আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার আচরণ করেনি বরং শুধু নিজের পার্থিব স্বার্থের জন্য দীনের দুশমনদের সাথে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদের সুযোগ আসা মাত্রই নিজেকে বিপদ থেকে রক্ষা করার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কুফর ও ইসলামের যুদ্ধে যে ব্যক্তির সমবেদনা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে নয়। কিংবা কুফরী ব্যবস্থা ও কাফেরদের পক্ষে আল্লাহর কাছে তার কোন আমল গ্রহণযোগ্য হওয়া তো দূরের কথা তার ঈমানই আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৯. এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হলো, নিজেদের বিবেচনায় তারা যেসব কাজ–কর্মকে নেকীর কাজ মনে করে আঞ্জাম দিয়েছে আল্লাহ তা সবই ধ্বংস করে দিবেন এবং তার জন্য তারা আখেরাতেও কোন পারিশ্রমিক পাবে না। অন্য অর্থটি হচ্ছে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দীনের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করছে তা সবই ব্যর্থ ও নিস্ফল হয়ে যাবে।

৪০. অন্য কথায় আমলসমূহের কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ হওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের ওপর। আনুগত্য থেকে ফিরে যাওয়ার পর কোন আমলই আর নেক আমল থাকে না। তাই এ ধরনের ব্যক্তি সে আমলের জন্য প্রতিদানলাভের উপযুক্তও হতে পারে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

কুফর অবলম্বনকারী, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টিকারী এবং কুফরীসহ, মৃত্যুবরণকারীকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং সন্ধির জন্য আহবান করো না।[৪১] তোমরাই বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি তোমাদের আমল কখনো নষ্ট করবেন না। দুনিয়ার এ জীবন তো খেল তামাশা মাত্র।[৪২] তোমরা যদি ঈমানদার হও এবং তাকওয়ার পথে চলতে থাক তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের ন্যায্য প্রতিদান অবশ্যই দিবেন। আর তিনি তোমাদের সম্পদ চাইবেন না।[৪৩] তিনি যদি কখনো তোমাদের সম্পদ চান এবং সবটাই চান তাহলে তোমরা কৃপণতা করবে এবং তিনি তোমাদের ঈর্ষা পরায়ণতা প্রকাশ করে দিবেন।[৪৪] দেখো, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ–সম্পদ ব্যয় করতে আহবান জানানো হচ্ছে অথচ তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজের সাথেই কৃপণতা করছে। আল্লাহ তো অভাব শূন্য। তোমরাই তার মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থানে অন্য কোন জাতিকে নিয়ে আসবেন। তারা তোমাদের মত হবে না।

৪১. এখানে এ বিষয়টি মনে রাখা দরকার যে, এমন এক সময় একথাটি বলা হয়েছিল যখন মদীনার ক্ষুদ্র জনপদে মুহাজির ও আনসারদের একটি ক্ষুদ্র দল ইসলামের

পতাকা বহন করছিলো। তাদেরকে শুধু কুরাইশদের মত শক্তশালী গোত্রের মোকাবিলা করতে হচ্ছিলো না বরং গোটা আরবের কাফের ও মুশরিকদের মোকাবিলা করতে হচ্ছিলো। এমন এক পরিস্থিতিতে বলা হচ্ছে সাহস হারিয়ে এ দুশমনদের সন্ধির আহবান জানাবে না, বরং জীবন বাজি রাখার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। মুসলমানরা কোন সময়ই সন্ধির জন্য আলোচনা করবে না একথার অর্থ তা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে সন্ধির আলোচনা করা ঠিক নয় যখন তার অর্থ দাঁড়াবে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করা। এবং তাতে শত্রু আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। মুসলমানদের উচিত প্রথমে নিজেদের শক্তিমত্তা দেখিয়ে দেয়া। এরপর সন্ধির জন্য আলোচনা করলে কোন ক্ষতি নেই।

৪২. অর্থাৎ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার অবস্থা কয়েকদিনের মনভুলানোর চেয়ে অধিক কিছু নয়। এখানকার সফলতা ও বিফলতা সত্যিকার ও স্থায়ী কোন কিছু নয় যা গুরুত্বের দাবী রাখে। প্রকৃত জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন। সে জীবনের সফলতার জন্য মানুষের চিন্তা–ভাবনা করা উচিত। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনকাবুত, টীকা ১০২)

৪৩. অর্থাৎ তিনি অভাব শূন্য। তাঁর নিজের জন্য তোমাদের থেকে নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি যদি তোমাদেরকে তার পথে কিছু ব্যয় করতে বলেন, তা নিজের জন্য বলেন না, বরং তোমাদেরই কল্যাণের জন্য বলেন।

৪৪. অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে এত বড় পরীক্ষায় ফেলেন না যা থেকে তোমাদের দুর্বলতাই শুধু প্রকাশ পেতো।